মাওবাদী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ

অসীম চট্টোপাধ্যায়

রাজনীতি ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে মাও-সে-তুং-য়ের বহুখ্যাত উক্তি হল, ‘রাজনীতি হল রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হল রক্তপাতযুক্ত রাজনীতি’। স্পষ্টতঃই মাও-সে-তুং যুদ্ধকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি বরং রাজনীতির ধারাবাহিকতা হিসেবেই যুদ্ধকে চিহ্নিত করেছিলেন। আমাদের পণ্ডিতমহলে একথা অজানা নয়। কিন্তু মজার কথা হল, এখানে রাজনীতি মোটামুটি নির্দোষ ব্যাপার হিসেবেই চিহ্নিত, কিন্তু যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রাম প্রায়শঃই অচ্ছুৎ বিষয়— অপরাধের তালিকাভুক্ত। সে কারণেই মাওবাদীদের সম্পর্কে এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে গরিব আদিবাসীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মাওবাদীরা এদের কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করছেন। সন্দেহ নেই যে, সমাজবদল ও সশস্ত্র সংগ্রামের সম্পর্কে নিহিত অস্পষ্টতাই এই সব অভিযোগের উৎস। অথচ দুনিয়ার ইতিহাস বিচার করলে সমাজ বদলের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের আত্মিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কে অস্বীকার করবেন এই সত্য যে বলশেভিকদের হাতের বন্দুকই একদা রাশিয়ার চেহারা বদলে দিয়েছিল, অথবা চীনের কমিউনিস্টদের হাতের রাইফেলই চীনের চেহারা বদলে দেয়।

সে কারণেই মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই করা হোক না কেন, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন বা আত্মপরিচয়লোপের বিরুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল করায় আমি কোন অন্যায় দেখি না। কারণ, প্রতিটি রাজনৈতিক দলই বিশ্বাস করে যে জনগণের প্রকৃত মঙ্গলসাধনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োজন। ক্ষমতার প্রশ্ন বাদ দিলে রাজনৈতিক দলগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হয়ে দাঁড়াবে। অনস্বীকার্য সত্য হল এটাই যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য দুটি পথ রয়েছে, এক, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর অথবা দুই, সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখল। দারিদ্র্য, অনুন্নয়নের প্রশ্ন তুলে নির্বাচনে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা হলে কোনো সময়েই কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এগুলি নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হলেই জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে। আসলে দারিদ্র্য ইত্যাদির প্রশ্ন ব্যবহার করে নির্বাচনে ক্ষমতালাভের চেষ্টা যতখানি নৈতিক, সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস ততটাই নৈতিক।

মাওবাদীদের এই প্রয়াস নিয়ে আপত্তির কোন কারণ দেখি না। বরং এই সব প্রশ্নে বছরের পর বছর ধরে জঙ্গলমহলে পড়ে থেকে যে ভাবে তাঁরা জঙ্গলমহলের মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন এবং এই অঞ্চলের দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, অবহেলা ও আত্মপরিচয় লোপের অপপ্রয়াসকে সারা দেশের সামনে তুলে এনেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

এই প্রশংসা সচরাচর শোনা যায় না। কারণ সমাজের শীর্ষে আসীন মধ্যবিত্ত বাঙালীবাবুদের এই অঞ্চল সম্পর্কে, এই অঞ্চলের অনুন্নয়নের মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত, উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অতীব দুর্বল। সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের মালভূমিতে ল্যাটেরাইট মাটি। পূবে সরস পলিমাটি থেকে যত পশ্চিমে যাওয়া যাবে ততই জেগে উঠবে রুক্ষ লাল পাথুরে জমি, যার জল ধারণ ক্ষমতা খুব কম। শীত বা গ্রীষ্মকালীন ফসল সম্ভব নয়, নিবিড় চাষের সম্ভাবনা নেই। তাই মজুরি খুবই কম। অরণ্যনির্ভর মানুষগুলি ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি বহাল থাকার কল্যাণে অরণ্যের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের নামে বনদপ্তরের কর্তাদের লুঠ চলেছে। একই লুঠ চলেছে কংসাবতী প্রকল্পে, যেখানে কমান্ড এরিয়া বড় কিন্তু সেচ ক্ষমতা সীমিত। জনসংখ্যার ২০% আদিবাসী, ২২% তফশিলি, ৫০% ওবিসি। সাক্ষরতার হার শোচনীয়। কর্মসংস্থান তথৈবচ— সংরক্ষণের সুবিধা নেওয়ার মতো অবস্থায় এরা নেই। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭৪টি ব্লক নিয়ে যে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ বা ‘পুপা’ গঠন করেছেন তার মধ্যে, আইআইটি-র সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চাদপদ ও সর্বাপেক্ষা পশ্চাদপদ ৪৩টি ব্লকই রয়েছে এই অঞ্চলে। এখানে অধিকাংশেরই ভাষা কুর্মালি, যাকে বাকি পশ্চিমবঙ্গ জানে না, মান্যতাও দেয় না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বহিরাগতদের ভীড়। এমনকি স্কুল শিক্ষকরাও বহিরাগত— তাঁরা এখানকার ভাষা বোঝেন না। সব দিক দিয়ে এখানকার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি জীবনযাপন প্রণালী নিয়ে গড়ে ওঠা আত্মপরিচয় মুছে দেওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ। এই বাস্তবতা না বুঝে শুধু বরাদ্দ বাড়িয়ে আমলানির্ভর যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে তা অকেজো থেকেছে, থাকবেও। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে নিজেদের আত্মবিলুপ্তির বিপদের সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘদিন-ব্যাপী বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার জঙ্গলমহলের মানুষের মুক্তির অন্য পথ না পেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হওয়া যেমন স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনই তাঁদের সামনে এই পথ তুলে ধরাও মাওবাদীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। আসলে জঙ্গলমহলের ঘটনায় আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ভারতে সশস্ত্র পথে সমাজ বদলের এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেখানে বলতেই হয় যে ঝাড়খণ্ড বা ছত্রিশগড়ের তুলনায় জঙ্গলমহলের সংগ্রাম অনেক বেশি জটিল ও কঠিন। বহুজাতিক পুঁজি-মুনাফার সন্ধানে ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ে আকরিক খনিগুলি দখল করায় সেখানের ব্যাপক আদিবাসী মানুষ নিজেদের বাপ-পিতামোর বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের সম্মুখীন। সেখানে উচ্ছেদ প্রতিরোধ সংগ্রামে ব্যাপক মানুষকে সংগঠিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জঙ্গল-মহলে এমন কোন আশু বিপদ না থাকায় এখানের সংগ্রাম তুলনায় কঠিন হবে। বিপ্লবী যুদ্ধ জনসাধারণের যুদ্ধ, জনসাধারণের সক্রিয়তা, উদ্যোগ ও সৃজনশীলতা উন্মোচিত না করে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের সাফল্য এর ওপরেই নির্ভর করবে। মাও সে-তুং বার বার বলেছেন যে বন্দুক নয়, বন্দুকের পেছনের মানুষটিই সংগ্রামের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। সেই হিসেবে জঙ্গলমহলে সশস্ত্র পথের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, তা আমার মনে হয় না। এটা এখন একটা মহান পরীক্ষা যেখানে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতা, সঠিকতার পাশাপাশি ভুলভ্রান্তিও রয়ে গেছে। তাই জঙ্গলমহল নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা রাষ্ট্রের বিপুল শক্তির সামনে মাওবাদীদের কোনও ভবিষ্যৎ দেখেন না। একথা ঠিক যে রাষ্ট্রের শক্তির তুলনায় মাওবাদীদের শক্তি এখনও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একথা কখনও ভুলে যাওয়া যাবে না যে ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকার পশ্চাদপসরণের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মহাসত্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া আজকের দুনিয়ায় আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত মহাশক্তিধরও ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের জন্য সংগ্রামরত ক্ষুদ্রশক্তিও বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারে, অতিশক্তিধরকেও পরাজিত করতে পারে। তাই মাওবাদীদের ভাগ্য কোন যৌথবাহিনী বা ‘গ্রীন হান্ট’ অভিযান নির্ধারণ করে দেবে না, সেই ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন মাওবাদীরাই। জঙ্গলমহলের মানুষদের চেতনার মান, সংগঠনের মাত্রা, কত দেশবাসীর সমর্থন তাঁরা কতটা অর্জন করতে পারবেন এবং তার ওপরেই তাঁদের ভাগ্য নির্ভর করছে। সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তাঁরা যেমন অপরাজেয় হতে পারেন, তেমনই ভুল পদক্ষেপে নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারেন।

একথা ঠিক যে মাওবাদীরা ঝাড়খণ্ডে, ছত্তিশগড়ে, জঙ্গলমহলে গেরিলা আক্রমণে বেশ বড় রকমের সামরিক সাফল্য অর্জন করেছেন। আবার সাথে সাথে তাঁদের অনেক দুর্বলতাও প্রকট হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতাগুলি নিয়ে আলোচনা জরুরি, কারণ এগুলির ফলশ্রুতিতেই মাওবাদীদের সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন মাওবাদীরা নিজেরাই। জঙ্গলমহলের সংগ্রামে যে দুর্বলতাগুলি চোখে পড়ছে সেগুলি হল :

এক, কমিউনিস্টদের কাছে সশস্ত্র সংগ্রাম হল শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের ফলশ্রুতি। তাই, সশস্ত্র সংগ্রামে কমিউনিস্টরা সকল সময়েই শ্রেণীপ্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশের দায়িত্ব নেন। মাওবাদীরা শ্রেণীপ্রশ্নে গুরুত্ব না দিয়ে, শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশের দায়িত্ব না নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নেমেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে সত্তর দশকের সংগ্রামে জমিনীতির অনুপস্থিতির ফলে এই প্রশ্নেই আমরা আটকে গিয়েছিলাম। চীনের নেতারা কৃষকদের বল

তেন, 'জমি দখল কর এবং নিজেদের শক্তিতে সংগ্রামের ফলকে রক্ষা কর।' এভাবেই চীনে জনযুদ্ধ গড়ে ওঠে। জমির লড়াইয়ের অনুপস্থিতিতে সত্তর দশকে আমাদের লড়াই হয়ে ওঠে সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই। লক্ষণীয়, মাওবাদীরা সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন।

দুই, সুন্দরবন থেকে লড়াই করার প্রস্তাব বা আধুনিক অস্ত্র আমদানির প্রস্তাব চারু মজুমদার এই যুক্তিতে নাকচ করে দেন যে অতিরিক্ত জঙ্গল-নির্ভরতা বা অস্ত্র-নির্ভরতা জনগণের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয়। একই যুক্তিতে তিনি বিস্ফোরণের রাজ-নীতির পক্ষে ছিলেন না। তাঁর ভুল লাইনে আমাদের ভুগতে হলেও জঙ্গল-নির্ভরতা ও অস্ত্র-নির্ভরতার কারণে মাওবাদীরা আজও জঙ্গল থেকে বের হতে পারেন নি এবং বিপুল সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক মূল ধারায় প্রান্তিক রয়ে গিয়েছেন।

তিন, রাজনীতিক সংগ্রামের নামে সিপিআই(এম)-নেতা-কর্মীদের দল ছাড়ানোর জন্য হত্যা, পীড়ন বা জুতোর মালা পরিয়ে মিছিলে হাঁটানোর যে পথ মাওবাদীরা নিয়েছেন তা রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ নয়, গা-জোয়ারি বন্দুকবাজির পথ। এঁদের অধিকাংশই গ্রামের গরীব মানুষ। মাওয়ের শিক্ষা হল 'কখনও শ্রেণীসংগ্রাম ভুলো না'।

চার, জঙ্গলমহলে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বহু দলের মানুষই জনসাধারণের কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে একদলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাবে মাওবাদীরা অপরাপর সকলকে বিচ্ছিন্ন করেন তাতে এ কথা স্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ রক্ষা করার ধৈর্য্য বা মানসিকতা মাওবাদীরা আয়ত্ব করতে পারেন নি। এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে না পারলে এদেশে সশস্ত্র উপায়ে সমাজবদলের ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরো একবার বন্ধ্যা প্রমাণিত হবে। কিন্তু এসবের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল নির্বাচন সম্বন্ধে মাওবাদীদের অবস্থান। ১৯৭৭ সালে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের মানুষ নির্বাচনী মঞ্চকে সফলভাবে ব্যবহার করে ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তারপর থেকে বার বার নির্বাচনকে ব্যবহার করে এদেশে শাসক পরিবর্তন ঘটেছে। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের আস্থা বেড়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে যখন সামরিক অভ্যুত্থান, প্রাসাদ-চক্রান্ত, ক্যু-দে-তা-র ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, তখন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা সমানে বহাল থেকেছে। ইতিহাসের শিক্ষা হলো, একদিকে যেমন নির্বাচন দিয়ে কোনও দেশেই মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি, তেমনই অন্যদিকে সংসদীয় ব্যবস্থা বহাল আছে এমন কোন দেশে আজ অবধি বিপ্লব সফল হয়নি। এই অবস্থায় রাজনৈতিকভাবে নির্বাচন বয়কটের শ্লোগান জনসাধারণের চাহিদাকে নাকচ করে কার্যত জনসাধারণকেই নাকচ করে দিচ্ছে কিনা এবং এর ফলে বিপ্লবী যুদ্ধ জনসাধারণের যুদ্ধের বদলে পার্টির যুদ্ধ হচ্ছে কিনা এবং এই কারণেই মাওবাদী আন্দোলন সমতলে নেমে আসতে অক্ষম হয়ে দেশের রাজনীতির মূলধারায় প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

ভারতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সমাজবদলের যে পরীক্ষা এখন চলেছে, তার সামনে যৌথবাহিনী বা 'সবুজ শিকার' অভিযানের থেকেও মৌলিক যে প্রশ্ন রয়েছে, তা হল ঘাঁটি এলাকা বা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন। আল্‌গা কথাবার্তায় বা লেখাপত্তরে প্রায়শই জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের ঘাঁটি এলাকা গড়ার কথা বলা হয়ে থাকে। আদতে এগুলি সবই গেরিলা অঞ্চল। বিশাল গেরিলা অঞ্চলে সংঘর্ষ পেরিয়ে সরকারি বাহিনী বা ব্যবস্থা যখন কোনও অঞ্চলে যেতেই পারে না, যেখানে ঘাঁটি এলাকা বা সমান্তরাল সরকার কায়েম হয়। যত বড় সামরিক সাফল্যই হোক, মাওবাদী আন্দোলন এখনও সে পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। কিন্তু মৌলিক প্রশ্ন হল, চীনের কায়দায় ভারতে এভাবে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কি টিকে থাকতে পারে? এই প্রশ্নে মাও সে তুং-য়ের বক্তব্য হল, লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘাঁটি এলাকা হল চীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোনও দেশে কখনও সম্ভব হয়নি। ঘাঁটি এলাকা উদ্ভবের জন্য মাও পাঁচটি শর্তের উল্লেখ করেছেন : এক, ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বদলে স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি। দুই, গণতান্ত্রিক বিপ্লরেব জমিতেই লাল এলাকার উদ্ভব হতে পারে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাহীন অঞ্চলে নয়। তিন, সারা দেশব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তার। চার, শক্তপোক্ত নিয়মিত লালফৌজের উপস্থিতি। পাঁচ, সুসংগঠিত ও নীতির ক্ষেত্রে নির্ভুল কমিউনিস্ট পার্টি। স্পষ্টত, ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি এই শর্তগুলি পূরণ করে না।

কিন্তু এই পাঁচ শর্তের থেকেও মাও জোর দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীদের অতি যুদ্ধবাজ সামন্তপ্রভুদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে। মাও স্পষ্ট বলেছেন যে যুদ্ধবাজ সামন্তপ্রভুদের মধ্যে যুদ্ধ না থাকলে লাল এলাকা টিকবে না। অন্যত্র 'যুদ্ধ ও রণনীতি' লেখায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সামন্তপ্রভুদের মধ্যে যুদ্ধ বৃদ্ধি পেলে লাল এলাকায় বিস্তার ঘটে এবং ওদের মধ্যে যুদ্ধ কমে গেলে লাল এলাকা সংকুচিত হয়। এই যুক্তি শৃংখলা বলে যে ওদের মধ্যে যুদ্ধ না থাকলে লাল এলাকা থাকে না। ভারতে শাসকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, ভাঙ্গন আছে, কিন্তু যুদ্ধ নেই। স্পষ্টত ভারতে লাল এলাকা উদ্ভবের বাস্তব অবস্থা অনুপস্থিত। একদা 'চীনের পথ আমাদের পথ' বলে আমরা লম্ফঝম্ফ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পা কেটে জুতোর মাপে বসানো যায়নি। মাওবাদীরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারলে সমাজবদলের ক্ষেত্রে, সংগ্রামের অনিবার্যতার ক্ষেত্রে, নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারবেন। সে কারণেই আমি বলেছি যে মাওবাদীদের সংগ্রাম নিয়ে শেষ কথা এখনই বলা যাবে না।